গোলাম মোসাব্বির
ভুতুড়ে বাড়ি

ভূতুড়ে বাড়ি

১.

অনেক দিন আগের কথা। কুসুমপুর নামের সুন্দর একটি গ্রাম ছিল। এই গ্রামের মানুষগুলো ছিল বেশ ধার্মিক ও সৎ। তারা জীবন জীবিকায় বেশ সুখী ও শান্তিময় জীবন যাপন করতো। তাদের এলাকায় কখনো কোন বড় ধরনের অপরাধ হতো না। এই গ্রামের মানুষের মধ্যে ছিল বেশ একতা। তাদের একতার জন্য গ্রামে অপরাধ একেবারেই ছিল না বলেই চলে। গ্রামটি ছিল রুপকথার ছবির মত সুন্দর। এই গ্রামে যারাই বেড়ানোর জন্য আসতো তাদের কাছে এই গ্রামটিকে স্বর্গপুরী মনে হতো। পড়ন্ত বিকেলে যখন সূর্য সোনালি আভা ছড়িয়ে দিতো তখন গ্রামটিকে ঠিক স্বর্গের মতো সুন্দর লাগতো।

হঠাৎ একদিন এই সুন্দর গ্রামে ঘটে যায় এক লোমহর্ষক দুঃখজনক দুর্ঘটনা। এরপর থেকে এই গ্রামে সন্ধ্যা নামলেই রাত হলেই নিশি অন্ধকারে অদ্ভুত ভাবে বদলে যেতে শুরু করে রাত্রিকালের পরিবেশ। রাত নিশি হলেই এক ভয়ংকর ভয় এই গ্রামের মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। কুসুমের মত কোমল এই কুসুমপুর গ্রামটি তখন দিনের বেলায় খুব সুন্দর থাকলেও রাতের বেলায় হয়ে উঠতো ভয়ংকর এক উপত্যকা।

রাতের গভীরতা বাড়লেই কুসুমপুরের সব মানুষ ঘরবন্দী হয়ে পড়তো।

রাতুলের খালা বাড়ি এই গ্রামে। তাই রাতুল একদিন রওনা হয় তার খালার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাতুল তার খালার গ্রামের বাড়ি কুসুমপুরে এসে লোকমুখে শোনতে পায়, গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি বিশাল বড় নদী আছে। নদীর নামটি হল কোমলমতী। এই কোমলমতি নদীটি অন্য গ্রাম থেকে এই কুসুমপুর গ্রামের শেষ সীমানাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই কোমলমতি নদীর পাড়ে ছিল একটি পুরনো প্রাসাদ। এই প্রাসাদের সাথেই জড়িয়ে আছে এক অমিত রহস্য।

জানা যায়, কোমলমতি নদীরে ধারের এই পুরনো প্রাসাদের মালিকই ছিলেন পুরো কুসুমপুর গ্রামের গ্রাম প্রধান। তার নাম ছিল রহিম ব্যাপারী। তিনি ছিলেন খুবই সৎ, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত একজন মানুষ। তিনি এই কুসুমপুর গ্রামের সকল মানুষের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসতেন। রহিম ব্যাপারী তিনি তার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সুখেই দিন কাটাতেন ঐ বিশাল প্রাসাদে। তার প্রাসাদটি ছিল অনেকটা আগের দিনের রাজাদের রাজ প্রাসাদের আদলে তৈরি। ফলে এই গ্রামের কেউ বিপদে পড়লে সবাই রহিম বেপারির শালিশের ঘরে চলে আসতেন। রহিম বেপারিও তার সাধ্যমত গ্রামের সবাইকে সহযোগিতা ও উপকার করতেন। যেজন্য গ্রামের সকলে তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতো। কিন্তু হঠাৎ একদিন রহিম বেপারির প্রাসাদে ঘটে যায় মারাত্নক এক লোমহর্ষক ঘটনা।

২.

এক রাতে হঠাৎ করে নিখোজ হয়ে যায় রহিম বেপারী ও তার সন্তান। এরপর সকালে গ্রামের লোকেরা এসে বেপারী প্রাসাদের শালিসের রুমের ছাদ থেকে রহিম বেপারীর স্ত্রী জুলেখার লাশ খোজে পায়। গ্রামবাসীরা জুলেখার লাশ মাটি দেওয়ার পর সারা গ্রাম তন্নতন্ন করে খোজেও রহিম বেপারী ও তার সন্তানের কোন হদিস পায়নি। গ্রামবাসীরা ধারণা করে রহিম বেপারি ও তার সন্তানকে কেউ গুম করে ফেলেছে। এই ট্রাজেডি ঘটনার পর থেকে গ্রামের মানুষ অনেক ভয় পেয়ে যায় এবং রাত নামলে ঘরবন্দী হয়ে যায়। ব্যাপারীর প্রাসাদে ঐদিন কি ঘটেছিল তা আজও কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে রাত হলেই কুসুমপুর গ্রামের ঐ বেপারী প্রাসাদে এক মানবীর ছায়া দেখা যায়। আবার সেই ছায়ার আর্তনাদের চিৎকারও শুনতে পায় কুসুমপুরবাসী।

প্রতি রাতেই ঘটে এমন ঘটনা ঘটে। তাই গ্রামবাসীরা ভয়ে ঐ বেপারী প্রাসাদের দিকে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেয়। ফলে সুখী সুন্দর গ্রাম কুসুমপুর দিনের আলোয় মোহিত থাকলেও রাতের আধারে হয়ে উঠে ভয়ংকর উপত্যকা।

৩.
রাতুল এই ঘটনা লোকমুখে শুনে স্থির করে সে যেভাবেই হোম ঐ বেপারী প্রাসাদে যাবে রাতের বেলায়। রাতুল ভালো করেই জানে তার খালা তাকে কখনো ঐ বেপারী প্রাসাদে যেতে দিবে না। তাই রাতুল তার খালাকে না জানিয়ে এক রাতে পরিকল্পনা করে সে যাবেই ওই ভূতুঁরে প্রাসাদে। যদিও ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে ঐ ভুতড়ে প্রাসাদে গ্রামের কেউই রাতের বেলা তো যাওয়া দূরের কথা, দিনের বেলাতেও কেউ ঐখানে যাওয়ার সাহস করে না। কারণ গ্রামবাসীদের সবাই জানে রাত নামলেই ঐ ভুতড়ে প্রাসাদ থেকে নারী কন্ঠের মায়াকান্নার আওয়াজ আর আর্তনাদ ভেসে আসে।

৪.
সূর্য মামা ডুবে যাওয়ার পর রাতুল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যা ৭টা বাজে প্রায়। সে অপেক্ষায় রইলো কখন তার খালার বাড়ির লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়বে? তার খালার বাড়ির লোকজনেরা ঘুমিয়ে পড়লেই সে চুপিচুপি দরজা খুলে ভুতুড়ে প্রাসাদের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়বে। ঘড়ি কাটায় যখন রাত ৮টা বাজলো তখন রাতুল খেয়াল করলো তার খালার বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এই গ্রামের নিস্তব্ধতা দেখে রাতুলের মনে হল এখন যেন রাত ৮টায় নয়, বরং রাত ২টা বেজে চলেছে। কারণ এই গ্রামে সন্ধ্যা নামলেই একেবারে শুনসান নিরবতা নেমে আসে। সন্ধ্যার পরই এই গ্রামের মেঠো পথ থেকে গ্রামের বাজার পর্যন্ত লোকশূণ্য হয়ে পড়ে। ফলে এমনিতেই এক ধরনের ভয়াবহ নিরবতা গ্রাস করে এই মায়াময় গ্রামকে। তাই সবাই সন্ধ্যা হলেই গভীর নিদ্রায় চলে যায়। রাতুল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলো, এরপর সে বুঝতে পারলো তার খালার বাড়ির লোকজন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সে কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সে তার খালার বাড়ি থেকে বের হয়ে গ্রামের মেঠো পথে নামলো। এই মুহূর্তে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাই সে তার পকেট থেকে টর্চ বের করে টর্চের অল্প অল্প আলোতে পথ চলতে লাগলো। রাতুল টর্চের পাশাপাশি দিয়াশলাইও এনেছে পকেটে করে।

রাতুল ভূতুড়ে কোন অভিযানে গেলে সব সময় দিয়াশলাই, টর্চ, দড়ি ইত্যাদি জিনিস সঙ্গে রাখে। কারণ বলা তো যায় না বিপদে কোন জিনিস কখন কাজে লাগে। গ্রামের এই নিস্তব্দতা দেখে রাতুলের কাছে মনে হল এই গ্রামে কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। এই মুহূর্তে রাতুলের কানে শুধু জি জি পোকার আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দই কানে আসছে না। রাতুল একমনে সাহস নিয়ে বেপারী প্রাসাদের উদ্দেশ্যে চলতে লাগলো। হঠাৎ রাতুলের মনে হল পেছন থেকে তাকে কেউ অনুসরণ করছে। কিন্তু পিছন ফিরে দেখলো চারিদিকে আসলে কেউই নেই। রাতুল ভূত টুত তেমন একটা ভয়ও পায় না। রাতের আবহাওয়া অনেকটা স্নিগ্ধ হলেও রাতুল হাটতে হাটতে ঘেমে যাচ্ছে। রাতুল ঘাম মুছতে মুছতে ভুতড়ে প্রাসাদের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। তারপর আবার তার মনে হলে কে জানি তাকে পিছন থেকে আবারও অনুসরন করছে। এবার সে তার পিছন দিকে ফিরে তাকালো। সে এবারও কাউকে দেখতে পেল না।

কিন্তু দূর থেকে হঠাৎ সে একটি নারী চিৎকার শুনতে পেল। রাতুল এই চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো। তার গা শিহরে উঠলো। চিৎকারটি বেপারী প্রাসাদ থেকেই আসলো বলে মনে হল রাতুলের কাছে। রাতুল ভয়ে ভয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। জংগলের ভেতর দিয়ে যখন রাতুল কয়েকটি গাছ পেরোলো তখনই বেপারী প্রাসাদের গেটটি তার চোখে পরলো। বিশাল এক প্রাসাদ। অনেকটা আগের দিনের রাজাদের প্রাসাদের মত। প্রাসাদের ভবনগুলোতে দারুণ সব কারুকাজ। টর্চের ক্ষুদ্র আলো ফেলে রাতুল মুগ্ধ হয়ে দেখছে। তার ভয় কেটে গেছে এসব কারুকাজ দেখে। কিন্তু পরক্ষণে আবারও এক নারীর আর্তনাদ শুনতে পেল সে। তার ধারনা প্রাসাদের ভবনের ছাদ থেকেই আওয়াজটা এলো।

৫.

বিশাল রাজকীয় গেট পেরিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকলো রাতুল। গুটগুটে অন্ধকার। টর্চ জাললো সে, প্রাসাদের ভেতরে বিশাল এক উঠান চোখে পড়লো রাতুলের।

নিজের মত করে বানিয়ে নেওয়া হয়েছে উঠানটি, এক নজর দেখেই বুঝা গেল। প্রাসাদের উঠান পেরিয়ে প্রথম ভবনের ঢোকার পথে বিশাল এক দরজা। সেই দরজার সঙ্গে লাগানো দেয়ালের ডান পাশেই রয়েছে কারুকাজ করা একটি কাচের জানালা। সেই কাচের জানালা থেকে স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ আর রহস্যময় আলো বের হচ্ছিল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার আর অদ্ভুত ভাবে চলা বাতাসের কারণে ভবনের দিকে এগোতে রাতুলের শরীর কিছুটা হিমহিম করছিলো। কারণ রাতুল ভূত ভয় না পেলেও এখন তার ভেতরে ভূতের ভয় ঢুকে গেছে। সে মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়ে নিলো।

৬.

রাতুল ভবনের সদর দরজা দিকে ঢুকতে যাবে ঠিক ঐ সময় ভবনের বিশাল দরজার কপাট ধীরে ধীরে খুলে গেল। দরজা খোলার শব্দে রাতুল চমকে উঠলো। টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকেই রাতুল বুঝলো এটি বিশাল একটি হলরুম। হলরুমে ধুলোমাখায় পড়ে আছে আগের দিনের কিছু খানদানি জিনিসপত্র। রাজকীয় সোফাগুলো ধুলো পড়ে জরাজির্ণ হয়ে গেছে। হলরুমের চারিপাশে টর্চের আলো ফেলার পর রাতুলের চোখে পড়লো হলরুমের ভেতরে একটি মসৃণ সিঁড়ি। এই সিড়িটি একেবারে দোতলায় উঠে গেছে। তার মনের হল এই সিড়ি দিয়ে কেউ এখনও উঠা নামা করে। এই কথা ভাবতেই রাতুল আবারও নারী কন্ঠের মায়া কান্নার শব্দ শুনতে পেল। রাতুলের মনে হল এই ভবনের উপরতলা থেকেই কান্নার শব্দটি আসছে। রাতুল দেরি না করে ঐ সিড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠা শুরু করলো।

সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই রাতুল দেখতে পেল বিশাল আরেকটি রুম। সম্ভবত এটি শালিসি রুম। শালিসি রুমের এক কোনায় আরেকটি খোলা দরজা দিয়ে আরেকটি রুম দেখা গেল। টর্চের আলোয় ঐ রুমের দরজার ফাঁক গলে রাতুলের চোখ পড়লো একটি পুরনো পিয়ানো, সোনালী গালিচা আর একটি বড় আয়না।

৭.
রাতুল গুটি গুটি পায়ে শালিসি রুম পেরিয়ে তার পাশের রুমে প্রবেশ করলো। এবার সে পিয়ানো আর সোনালি গালিচার পাশ কাটিয়ে সেই অদ্ভুত আয়নার সামনে গিয়ে টর্চ জ্বাললো। আর তখনই শিরদাড়ার মত ঘটনা ঘটলে। সেই আয়নার ভেতরে ভেসে উঠলো রক্তাক্ত আহত এক সুন্দরী নারী। রাতুলকে দেখেই সেই রক্তাক্ত নারী বলে উঠলো- এখানে কেন এসেছিস। আমাকে নষ্ট করে কি তোদের আফসোস মেটেনি। আমাকে তোরা খুবলে খেয়েছিস। আমি তোদেরকে ছাড়বো না। রাতুল এই দৃশ্য দেখে নির্বাক হয়ে গেল। এমন আচমকা ঘটনায় রাতুল অনেক ভয় পেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বললো- দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না।

চুপ কর শয়তান। ধমক দিয়ে রাতুলকে থামিয়ে দিয়ে আয়নার ভেতরে আহত নারী আবার ভয়ংকর কণ্ঠে বলে উঠলো- কি বললি তোদেরকে আমি ভুল বুঝবো! হাহাহাহা। অট্টো হাসি দিল সেই নারী কণ্ঠি প্রেতাত্মা।

আমার স্বামী সন্তানকে কোথায় নিয়ে লুকিয়েছিস বল? তোরা আমার স্বামী পুত্রকে নিয়ে জিম্মি করে নিয়ে গেলি আর আর আমাকে নষ্ট করে খুচিয়ে খুচিয়ে মারলি। এই গ্রামবাসীকে আমার স্বামী এত এত উপকার করেছে, অথচ এই গ্রামবাসীও আমাদের রক্ষা করতে এলো না। আসবে কি করে? তোরা মুখোশধারী দল, যখন এই গ্রামের মানুষ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আমার বাড়িতে নিশিরাতে এসে তোরা হানা দিয়েছিলি।। তাই কেউ আমাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসেনি। তোরা বলেছিলি তোরা রঘু ডাকাতের দল। তোদেরকে তো সোনা দানা হিরা মুক্তা টাকা পয়সা যা আছে সব দিয়েছিলাম। তোরা কেন এমন করলি! আমার স্বামীকে আমার সন্তানকে তোরা ধরে নিয়ে গেলি আর আমাকে নষ্ট করে মেরে ফেলে গেলি সালিশি রুমের ছাদে।

আমি তোদের জন্যই আজ প্রেতাত্মা হয়ে গেছি। আমি তোদের কাউকে ছাড়বো না।

৮.
এই কথা বলে মায়া কান্না করতে করতে আর অট্টো চিৎকার দিয়ে আয়নার ভেতর থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সেই রক্তাক্ত আহত নারীর প্রেতাত্মা।

এই দৃশ্য দেখার পর রাতুল অনেকটা নির্বাক হয়ে গেল। রাতুল এবার বুঝতে পারলো আসলে কি ঘটেছিল ঐদিন এই বেপারী প্রাসাদে। রাতুল যেহেতু এই গ্রামের কেউ না। তাই রাতুলকে আগন্তুক ভেবে ডাকাত দলের সদস্য ভেবেছিল এই নারী প্রেতাত্মা। তাই এই নারী প্রেতাত্মা আয়নায় ভেসে উঠে রাতুলকে দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করলো। প্রেতাত্মার এই ক্ষোভ প্রকাশের ফলে রাতুলের কাছে অনেক কিছুই দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে গেল।

তবে রাতুলের মনে মনে প্রশ্ন জাগলো- প্রেতাত্মা যদি আমাকে রঘু ডকাতের সদস্যই ভেবে থাকে তাহলে আমার কোন ক্ষতি করলো না কেন?

এই কথা ভাবতে ভাবতেই রাতুলের মনে পড়লো- আরে আমি তো এখানে আসার সময়ে আয়াতুল কুরসি পড়ে এসেছি। আর তাছাড়া আলো যেখানে থাকে সেখানে প্রেতেরা বেশিক্ষণ থাকে না।

এছাড়া তার কাছে দিয়াশলাইও ছিল। আর ভূত-পেত্নীরা দিয়াশলাইয়ে থাকা বারুদকেও খুব ভয় পায়। তাই রাতুলের মনে হল- আয়াতুল কুরসি, টর্চ লাইটের আলো আর দিয়াশলাইয়ের কারনেই আজ সে বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেল।

লেখক পরিচিতি

গোলাম মোসাব্বির মূলত 'রাকিব মোসাব্বির' নামে বেশি জনপ্রিয়। তিনি বাংলা সঙ্গীতের একজন জনপ্রিয়, খ্যাতিমান কণ্ঠশিল্পী, সুরকার, গীতিকার ও সঙ্গীত পরিচালক। তিনি মূলত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি তার পরিচিত ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে মাল্টি ট্যালেন্ট হিসেবেই সমাদৃত। তিনি এই পর্যন্ত অসংখ্য জনপ্রিয় গানের সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে নিজের সঙ্গীত ক্যারিয়ার গড়েছেন। ২০৫ সালে ক্লোজ আপ ওয়ান দিয়ে তার মিডিয়া যাত্রা শুরু হলেও ২০০৭ সালে ‘যারে আমার মন’ গানটি দিয়ে অফিসিয়ালি তার সঙ্গীত ক্যারিয়ার শুরু হয়। এছাড়া তিনি একাধারের লেখক, কলামিস্ট ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা। তিনি সঙ্গীত ও সাহিত্যের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করেছেন মিডিয়া কোম্পান, আইটি কোম্পানি ও অডিও রেকর্ড লেবেল কোম্পানি।

'গল্পপুথি' প্রকাশনী